পুলিশ কেন বর্বর

রিপোর্ট : **রাজু আহমেদ**

বলা হয়ে থাকে, পাঁচটি ইংরেজি শব্দের আদ্যক্ষর নিয়েই ‘পুলিশ’ শব্দটি গঠিত। যেমন- ‘পোলাইট’ (অর্থ ভদ্র) থেকে ‘পি’, ‘ওবিডিঅ্যান্ট’ (বাধ্যগত বা কর্তব্য পরায়ণ) থেকে ‘ও’, ‘লয়েল’ (অনুগত) থেকে ‘এল’, ‘ইনটেলিজেন্ট’ (বুদ্ধিমান) থেকে ‘আই’, ‘কারেজিয়াস’ (সাহসী) থেকে ‘সি’ এবং ‘এফিসিয়েন্ট’ (দক্ষ) থেকে ‘ই’। কিন্তু এসব মাহাত্ম্যপূর্ণ শব্দ বাংলাদেশের পুলিশের সঙ্গে আদৌ কী মানায়?

গত সপ্তাহে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাটের নিরীহ কৃষকদের ওপর নির্বিচার গুলি চালিয়ে সাত জনকে হত্যা করে পুলিশ আবারো প্রমাণ করেছে ওপরের শব্দগুলো তাদের জন্য একেবারেই বেমানান। এর আগেও পুলিশ অনেক অপকর্ম করেছে যা দেশব্যাপী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে- ১. কয়েক বছর আগে দিনাজপুরে ইয়াসমিন এবং চট্টগ্রামে সীমা চৌধুরীকে ধর্ষণ ও হত্যা করে পুলিশ। ইয়াসমিন হত্যা মামলায় দায়ীদের শাস্তি রায় হলেও সীমা চৌধুরী হত্যা মামলায় পার পেয়ে গেছে পুলিশ সদস্যরা। অভিযোগ রয়েছে, পুলিশ সদস্যদের রক্ষা করতে তদন্তকারী পুলিশ দায়সারা চার্জশিট দেওয়ার কারণেই আদালতে রক্ষা পেয়ে গেছে ধর্ষক ও হত্যাকারী পুলিশ। ২. চট্টগ্রামের হালিশহর এলাকায় ওয়াহিদ মুজিব নামে এক ব্যবসায়ীর ১০ লাখ টাকা ছিনতাই করে সিএমপির গোয়েন্দা ও হালিশহর থানায় কর্মরত দুই পুলিশ সদস্য। বিষয়টি নিয়ে পুলিশের উচ্চ পর্যায়ে অনেক কথাবার্তা হলেও পুলিশ সদস্যদের বরখাস্ত করা হয়নি এবং অভিযোগ প্রমাণের পরও ব্যবসায়ীদের টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। ৩. গত বছরের ৩ এপ্রিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে গুলশান জোনের ট্রাফিক সার্জেন্ট মাহফুজুর রহমান ও তার ভাই সহযোগীদের নিয়ে আমেরিকা ফেরত ব্যবসায়ী মো. আহসান উল্লাহ চৌধুরীকে অস্ত্রের মুখে অপহরণের চেষ্টাকালে জনতা, আইনজীবী ও কর্মরত পুলিশের হাতে ধরা পড়েন।

পুলিশ কী চিরকালের ‘ঠোলা’?

দেশে আইন-শৃংখলা রক্ষা, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, অপরাধীকে শনাক্তকরণ ও গ্রেপ্তারের মাধ্যমে শাস্তিমূলক বিচার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যই পুলিশ বাহিনীকে পোষা হয়। এক কথায়, জানমালের নিরাপত্তা বিধান করাই পুলিশের সুমহান দায়িত্ব। কিন্তু প্রকৃত অর্থেই কি এই বাহিনী জনগণের বৃহত্তর কল্যাণে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে? এ প্রশ্নটি দিনদিন বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। কারণ ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি, চুরি-ছিনতাই, হত্যা-খুন, ডাকাতি-রাহাজানি ও দুর্নীতি দেশের সর্বস্তরের মানুষকে এক ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিলেও এসব ন্যাক্কারজনক ঘটনা রোধে পুলিশ বাহিনী ততটা ভূমিকা রাখতে পারেনি যতটা তাদের পক্ষে করা সম্ভব এবং জাতি আশা করে। বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা বাদ দিলে কুখ্যাত ও পেশাদার অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে সার্বিক অপরাধ দমনে পুলিশের সাফল্য বলতে গেলে চোখে পড়ে না। বরং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত নিষ্ক্রিয়তা, রহস্যজনক আচরণ, লোক দেখানো দুর্বল তৎপরতা এবং সবমিলিয়ে চূড়ান্ত এক ব্যর্থতার অভিযোগ জোরালো হয়ে উঠেছে। পুলিশ একদিকে জনগণের আস্থা-বিশ্বাস ও সমর্থন অর্জন করতে পারেনি অন্যদিকে তারা কারণে-অকারণে কিংবা তুচ্ছ ঘটনার জের ধরে জনগণকে নানাভাবে নাজেহাল করে আসছে। সেজন্য দেশের মানুষও সব সময়ই ‘ঘৃণা ভরে’ পুলিশকে ‘ঠোলা’ বলে ডাকে। কিন্তু পুলিশ বাহিনী কী তা বোঝে?

পুলিশ-অপরাধী সখ্যতা!

গ্রাম-শহর নির্বিশেষে সারাদেশে প্রতিদিন অসংখ্য অপরাধ সংঘটিত হলেও এর অধিকাংশেরই কোনো কুলকিনারা করতে পারে না পুলিশ। এর ওপর কখনো কখনো অপরাধের শিকার নির্যাতিত-ক্ষতিগ্রস্তদের উল্টো হয়রানি করা হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। সাধারণভাবে পুলিশ আর অপরাধীর দুই মেরুতে থাকার কথা। কিন্তু এদেশে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে পুলিশের নিবিড় সম্পর্ক নিয়ে অনেক জনশ্রুতি রয়েছে। অভিযোগ আছে, একদিকে নিম্ন পর্যায়ের পুলিশদের অনেকেই বিপথগামী হয়ে ক্রমেই বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে, অন্যদিকে বেশ ওপরের বহু কর্মকর্তাও দাগী আসামীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে থাকে বলে অভিযোগের শেষ নেই। উৎকোচ দিয়ে এক শ্রেণীর পুলিশের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলার সুবাদে অসংখ্য অপরাধী পার পেয়ে যায় আর একের পর এক অপরাধ করতে থাকে। ফলে সাধারণ জনগণের ওপর নানামুখি হয়রানি, নির্যাতন ও ভোগান্তি বাড়ে।

সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে মাসোহারা গ্রহণ

সাধারণ মানুষের অভিযোগ, পেশাদার খুনিসন্ত্রাসী, ছিনতাইকারী, টেন্ডারবাজ, সন্ত্রাসী ও সমাজবিরোধীরা পুলিশকে নিয়মিত মাসোহারা দিয়ে দেদারসে বেআইনি কার্যকলাপ চালায়। দেশের সবকটি থাকা এলাকাতেই এ অবস্থা বিরাজমান। ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন দেখা যায়, থানার আসবাবপত্র কেনা থেকে শুরু করে অতিথি আপ্যায়ন, হাজতিদের খাওয়া, পরিবহন ও জ্বালানি খরচ ইত্যাদি ‘ম্যানেজ করে’ মেটায় পুলিশ। এই ‘ম্যানেজ’ করার ব্যাপারটিই পুলিশকে সামাজিক অপরাধীদের সঙ্গে জড়িত করে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, মেট্রোপলিটন এলাকায় মামলা-মোকদ্দমা থেকে যে আয় হয় তা পুলিশের মোট জ্ঞাত অবৈধ আয়ের সাড়ে ২৪ শতাংশ। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এই হার পুলিশের মোট আয়ের যথাক্রমে ২৫ শতাংশ ও ৩০ শতাংশ। মেট্রোপলিটন থানায় অবৈধ আয়ের ৩৭ শতাংশ আসে অবৈধ পণ্যের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। জেলা ও উপজেলায় এই হার যথাক্রমে

৩৫ ও ৪৩ শতাংশ। মাদক ও অবৈধ অস্ত্র এবং নকল ও নিষিদ্ধ পণ্য ব্যবসায়ীরা নিজেদের ব্যবসাকে নির্বিঘ্ন রাখতেই পুলিশকে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থের যোগান দেয়।

এছাড়া মামলার প্রতিপক্ষকে গ্রেপ্তার করানো, গ্রেপ্তার দেখানো, মামলা প্রভাবিত করা, সহজে জামিনের ব্যবস্থা করা, চার্জশিট থেকে নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রচুর টাকা নেয় পুলিশ। এভাবেও এক সময় অপরাধীদের সঙ্গে পুলিশের গভীর সখ্যতা ও সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সরকারি দলের লাঠিয়াল

পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে আরেকটি বড় অভিযোগ হচ্ছে, এ উপমহাদেশে মানুষের মুক্তির সংগ্রাম নস্যাৎ করতে ব্রিটিশ শাসকরা যেভাবে পুলিশ বাহিনীকে কাজে লাগিয়েছে দেড় শতাধিক বছর পরেও স্বাধীন বাংলাদেশে সামরিক স্বৈরাচার ও গণতান্ত্রিক নির্বিশেষে সবাই ক্ষমতায় টিকে থাকতে পুলিশকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করেছে। এসব সরকার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেয়ে তথাকথিত রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি এবং প্রতিপক্ষ ও বিরুদ্ধমতের নেতা-কর্মীদের হয়রানি, হেনস্তা ও নির্যাতন করতে এই বাহিনীকে লাঠিয়াল হিসেবেই ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ দলীয়করণের যাঁতাকলে পড়ে পুলিশ সরকারি দলের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে জিম্মি হয়ে যায়। সরকারের পেটোয়া বাহিনীতে পরিণত হয়।

কিন্তু সরকারি দল ক্ষমতা হারিয়ে যখন বিরোধীদলে পরিণত হয় তখন তারা নিজেরাই আবার নাকাল হয় পুলিশের হাতে। কারণ ক্ষমতার রদবদলের সাথে সাথেই বদলে যায় পুলিশের আক্রমণের লক্ষ্য। যেমন- বিগত আওয়ামী লীগ শাসনামলে পুলিশের বড় টার্গেট ছিল প্রধান বিরোধী দল বিএনপি। আর এখন সেই নির্যাতন চলছে আওয়ামী লীগের ওপর। যেমন- এর ১৯৯১-৯৬ সালের বিএনপি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী ক্ষমতা ছাড়ার কিছুদিন পরই পুলিশের পিটুনির শিকার হয়েছেন। এতে তার হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল। অন্যদিকে ক্ষমতা ছাড়ার এক মাসের মাথায় আওয়ামী লীগের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের মাথাও ফাটিয়ে দেয় সেই পুলিশ, যারা একদা এই লোকটির হুকুম তামিলে ব্যস্ত ছিল। পুলিশের এ ধরনের অপব্যবহার এবং তাদের অশোভন আচরণকে দেশে গণতন্ত্র বিকাশের পথে অন্যতম বাধা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

দেড়শ বছরের পুরনো আইন

অবশ্য বাহিনী হিসেবে পুলিশের জন্ম ও বেড়ে ওঠার ঐতিহাসিক পটভূমিই তাদেরকে জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে করে রেখেছে বলেও মনে করা হয়। জানা যায়, আইন-শৃংখলা রক্ষার নামে ১৮৬১ সালে একটি আইন করে তৎকালিন ব্রিটিশ এদেশের জন্য পুলিশ বাহিনী গঠন করে। আইন-শৃংখলা রক্ষার নামে পুলিশ বাহিনী গঠন করা হলেও মূলত স্বাধীনতাকামীদের নিপীড়নের মাধ্যমে উপনিবেশবিরোধী সংগ্রাম দমন করাই ছিল ব্রিটিশ সরকারের মূল লক্ষ্য। ঔপনিবেশিক শাসকদের হাতে গড়া ওই পুলিশেরই উত্তরাধিকার বাংলাদেশের এখনার পুলিশ। সেজন্যই হয়ত ৫৮ বছর আগে ব্রিটিশরা উপমহাদেশ ছেড়ে গেলেও এদেশের পুলিশের ওপর থেতে তাদের আছর এখনো যায়নি।

তবে একথাও ঠিক ব্রিটিশদের বিদায়ের পর পাকিস্তানের ২৪ বছর এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ৩৪ বছরেও দেড়শ বছরের পুরনো পুলিশ আইন ও সাংগঠনিক কাঠামো এখনো রয়ে গেছে। যেমন- ১৮৬১ সালের পুলিশ অ্যাক্ট, ১৮৬০ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৩৬ সালের ট্রেনিং ম্যানুয়াল এবং ১৯৪৩ সালের রেগুলেশন অনুযায়ীই চলছে বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীর সামগ্রিক কার্যক্রম।

বাংলাদেশের পুলিশী কাঠামো

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন, শিল্পায়ন, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বিভাগেরও সম্প্রসারণ হয়েছে। তবে কার্যপরিধি ও নীতিমালায় মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয়নি। যাই হোক, এ দীর্ঘ সময়ে দেশে উদ্বেগজনকভাবে অপরাধ বেড়েছে, পরিবর্তিত হয়েছে অপরাধের ধরণও। এতে পুলিশের কর্মকাণ্ডও বহুগুণ বেড়েছে। বাড়েনি শুধু তাদের

‘সব সরকারই পুলিশকে জনস্বার্থের বদলে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছে’

এএসএম শাহজাহান

সাবেক মহা-পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ

সাপ্তাহিক ২০০০ : বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

এএসএম শাহজাহান : নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পুলিশ বাহিনীর যথেষ্ট কাজ করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু তারা সেটুকু করতে পারছে না। সন্ত্রাস দমনসহ সবক্ষেত্রেই পুলিশের ভূমিকা সামগ্রিক নয়। জনগণের সঙ্গেও তাদের বড় ধরনের দূরত্ব রয়েছে। আমি মনে করি জনগণের সহায়তা নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতেই পুলিশ আরও বেশি কাজ করতে পারে।

২০০০ : পুলিশ বাহিনীর এ অবস্থার কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?

এএসএম শাহজাহান : এক্ষেত্রে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ বর্তমান আইন। যেসব আইন ও বিধি অনুযায়ী এদেশের পুলিশ বাহিনী পরিচালিত হয় তা কোনোভাবেই যুগোপযুগি নয়। ব্রিটিশ আমলে উপনিবেশ টিকিয়ে রাখার স্বার্থে পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়। সে উদ্দেশ্যেই তারা আইন-কানুন প্রণয়ন করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার দীর্ঘকাল পরও সেসব আইন দিয়েই চলছে আমাদের পুলিশ বাহিনী। তাদের ট্রেনিং ম্যানুয়েলের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এ কারণেই পুলিশ বাহিনী গণমুখী চরিত্র অর্জন করতে পারছে না।

২০০০ : সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে। বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখেন?

এএসএম শাহজাহান : এ ধরনের পরিস্থিতি অত্যšÍ দুর্ভাগ্যজনক। পুলিশ সদস্যরা যেখানে অপরাধ দমনে নিজেদের নিয়োজিত রাখবে, সেখানে তারা নিজেরাই অপরাধ করছে। আমি মনে করি, প্রশাসনিক দুর্বলতাই এ অবস্থার মূল কারণ। পুলিশে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হলে, যোগ্যরা নিয়োগ পেলে, প্রশিক্ষণ যথাযথ হলে, সামগ্রিক পরিবেশ সুস্থ থাকলে, তাদের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পালে এ অবস্থা তৈরি হতো না। এসব দুর্বলতাই পুলিশকে নানা প্রশ্নের মুখে দাঁড় করা"Q। প্রশাসনিকভাবে এগুলো ঠিক করতে না পারলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে না।

২০০০ : প্রত্যেক সরকারের আমলেই পুলিশ বাহিনীকে দলীয়করণের অভিযোগ ওঠে। অনেকে এটিকেই পুলিশের মূল সমস্যা মনে করেন। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

এএসএম শাহজাহান : এটা সত্যি, যারাই যখন ক্ষমতায় এসেছে তারাই পুলিশকে নিজেদের মতো কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছে। এক সরকার ক্ষমতায় এসে আগের সরকারের অনেক কিছু পরিবর্তন করে। আগামীতেও এর ব্যতিক্রম হবে না। সবাই পুলিশকে ব্যবহার করছে– জনস্বার্থে নয়, দলীয় স্বার্থে।

২০০০ : পুলিশ বাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য কোন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার?

এএসএম শাহজাহান : পুলিশের আধুনিকায়ন করতে হলে এর আমূল সংস্কার প্রয়োজন। প্রথমেই একে একটি বাহিনীর পরিবর্তে সেবা সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য প্রয়োজন বর্তমান আইন, বিধি ও ট্রেনিং ম্যানুয়েলের আধুনিকায়ন। পুলিশের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এ বাহিনীকে জনগণের বন্ধু হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

সুনাম আর সাফল্য।

যাই হোক, দেশে বর্তমানে মোট ৫৬৯টি থানা সংখ্যা। এসব থানা এবং পাশাপাশি ফাঁড়ি থেকেই তৃণমূল পর্যায়ে তাদের কার্যক্রম চলে। তবে অপরাধ দমন ও আইন-শৃংখলা রক্ষায় পুলিশের ব্যর্থতার আরেকটি কারণ হচ্ছে জনবলের স্বল্পতা এবং পর্যাপ্ত অস্ত্র, যানবাহন ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব। বিশেষ করে দেশে এখনো জনসংখ্যার তুলনায় পুলিশের সংখ্যা খুবই সীমিত। যেমন- বিশাল জনসংখ্যা অধ্যুষিত রাজধানী ঢাকায় বর্তমানে থানার সংখ্যা ২৮টি। অথচ প্রায় একই সমান জনসংখ্যা অধ্যুষিত ভারতের রাজধানী দিল্লিতে থানার সংখ্যা ১শ'রও বেশি। দেশের বিভিন্ন জেলা সদরের মধ্যে আয়তন ও জনসংখ্যার তারতম্য থাকলেও কোথাও একটির বেশি থানা নেই। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, উপজেলা পর্যায়ে ৮ হাজার ৮শ' ৩৯ জনের জন্য একজন, জেলা সদরে ১০ হাজার ৪শ' ৫৭ জনের জন্য একজন এবং মেট্রোপলিটন থানাগুলোতে প্রতি ১৬ হাজার ১শ' ৭ জনের জন্য একজন পুলিশ রয়েছে। জাতীয় সংসদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দেশের প্রতিটি থানায় গড়ে একজন মাত্র পরিদর্শক, ২ জন সাব-ইন্সপেক্টর এবং ২ জন এসিট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োজিত রয়েছে। মহানগর এলাকার থানাগুলোতে অবশ্য এ সংখ্যা দু' থেকে তিনগুণ বেশি। পুলিশ বিভাগের নিয়মানুযায়ী পরিদর্শক ও সাব-ইন্সপেক্টররাই থানায় দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলার তদন্ত করে থাকেন। থানাগুলোতে এসব পদে কর্মকর্তার অপ্রতুলতা মামলার তদন্তে ধীরগতির অন্যতম প্রধান কারণ। পুলিশ বাহিনীর বৃহৎ অংশ কনস্টেবলদের নিরাপত্তা ডিউটি ও কর্মকর্তাদের সফর-সঙ্গী হওয়ার দায়িত্বই বেশি পালন করতে হয়। ফলে তারা জনগণের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। ওয়ারেন্ট আদেশ তামিল, অস্ত্র উদ্ধার এবং আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব সাব ইন্সপেক্টররা পালন করতে পারেন।

নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি

পুলিশের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি থাকলেও এসব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনাই হয়ে উঠে প্রধান। একদিকে ক্ষমতাসীন সরকার তাদের দলীয় স্বার্থে এসব সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়, অন্যদিকে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধেও বিরাট অংকের উৎকোচ দিয়ে পদোন্নতি নেওয়া এবং পছন্দের থানায় বদলি হওয়ার সুযোগ নেয় বলে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। খোদ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদনেও এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও বিধি-বিধান লঙ্ঘন করে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি দেওয়ার কারণেই পুলিশ বিভাগের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। ফলে এই বাহিনীর সেবার মানও হ্রাস পায়।

দেশে পুলিশের নিয়োগ হয় তিনটি স্তরে। এরমধ্যে সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) মাধ্যমে এএসপি, পুলিশের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয়ভাবে সাব-ইন্সপেক্টর এবং কনস্টেবল নিয়োগ করা হয়। গত এক যুগ ধরেই এই তিনটি পদেই নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয়করণের ব্যাপক অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

ঘুষ ছাড়া নড়ে না পুলিশ!

সাধারণ মানুষের বন্ধু হিসেবে তাদের সংকটে পাশে দাঁড়ানোই পুলিশ বিভাগের মৌলিক দায়িত্ব। কিন্তু পুলিশ প্রত্যাশা অনুযায়ী জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে এমন নজির খুব কমই পাওয়া যাবে। সেজন্য নিছক প্রয়োজনের তাগিদে ও চরম বিপদে পড়ে বাধ্য না হলে সাধারণ মানুষ পুলিশের ধারে-কাছেও যেতে চায় না। টিআইবির এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দেখা গেছে, অর্থ না দিয়ে থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের করতে পারে না সাধারণ মানুষ। গ্রাম-শহরভেদে থানাগুলোতে ৮০ শতাংশেরও বেশি মামলা দায়ের হয় অর্থের বিনিময়ে। এক একটি মামলার জন্য থানাকে ৫শ' থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। আবার আসামি ধরার ক্ষেত্রেও মূল চালিকাশক্তি অর্থ।

অভিযোগ আছে, রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় রাতের বেলা যে সব টহল পুলিশ নিয়োগ করা হয় তাদের দ্বারা নিয়মিত হয়রানির শিকার হন সাধারণ মানুষ। প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার না করে নিরপরাধ মানুষকে মামলায় জড়ানোর ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় কিংবা জড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে প্রচুর।

পুলিশ যে ঘুষ ছাড়া কোনো কাজ করে না

পুলিশের কর্মকান্ড!

গভীর রাতে টেলিফোন বেজে ওঠে। রিসিভার হাতে নিতেই অপরপ্রান্ত থেকে পুলিশের কর্মকর্তার পরিচয় দিয়ে প্রাণনাশের হুমকি আসে। টেলিফোনে বলা হয়, দ্যাখ বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে। ওমুককে সিস্টেম করেছি। তোরও মায়ের বুক খালি হবে। যা করার তড়িঘড়ি করতে হবে। এই বলে টেলিফোন খট করে রেখে দেয়। মুহূর্তে টেলিফোন রিসিভকারীর সারা শরীর শিউরে ওঠে। আশঙ্কা এক সময় সত্যি হয়। হুমকি প্রদানকারী পুলিশ অফিসার কিছুদিনের মধ্যে ভাইকে খুন করে। ঘটনাটা ঘটে গত বছর কাফরুল থানাধিন।

কাফরুল থানার ওসি রফিকের এমন সন্ত্রাসী ঘটনা বুঝিয়ে দেয় পুলিশ এখন কত ভয়ঙ্কর। পুলিশের এমন বেপরোয়া সন্ত্রাসের কারণ হিসেবে পুলিশের সাবেক আইজি ড. এনামুল হক বলেন, পুলিশের বেতন বাড়ানো উচিত। বেতন-ভাতার স্বল্পতার কারণে পুলিশের মনোবল ভেঙে যায়। অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

পুলিশের বেতন ভাতা নিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা বলেন, প্রশিক্ষণের সময় বেতন মাত্র দেড় হাজার টাকা, যার সিংহভাগ যায় খাওয়া বাবদ। এরপর ৬ মাস পর তিন হাজার হয়। এই তিন হাজার নতুন পে-স্কেলে দেয়া হচ্ছে। গত বছর অক্টোবরে এই নতুন স্কেল ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে আড়াই হাজার টাকা ছিল। এদিকে রমনা থানার অপর এক কনস্টেবল জানান, তারা এখনো নতুন পে-স্কেলে বেতন পাচ্ছে না। নাম প্রকামের অনিচ্ছুক সে কর্মকতাই জানান, গত রোজার ঈদের আগে পে-স্কেল ঘোষণা করলেও দু' দুটি ঈদ হয়ে গেলো, নতুন পে- স্কেলে বেতন পাইনি।

বিষয়টি আংশিক স্বীকার করেন এসিসটেন্ট পুলিশ কমিশনার হিসেবে বিভাগের রেবেকা সুলতানা। পুলিশের কর্মকর্তা বলেন, ২০ হাজার পুলিশ সদস্যের অনেককেই দেওয়া হয়েছে। তবে সবাইকে দেয়া যায়নি প্রশাসনিক জটিলতার কারণে। যাদের দেয়া হয়নি তাদের টাকা (প্রায় ১০ লাখের মতো) এখনো আছে। কাগজ পত্রের জটিলতা দূর হলেই তারাও পেয়ে যাবে।

ঠিক কতজনকে টাকা দেয়া হয়েছে এর সঠিক সংখ্যা জানাতে কিম্বা সে বিষয়ে কোনো কাগজপত্র দেখতে চাইলে এসিসটেন্ট পুলিশ কমিশনার রেবেকা সুলতানা জানাতে ও দেখাতে অপারগতা জানান। তিনি বলেন, 'সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনুমতি লাগবে।'

সেটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির এক প্রতিবেদনেও উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, 'এফআইআর দাখিল কিংবা জিডি এন্ট্রি করতে গেলেও জনসাধারণকে প্রচুর দুর্ভোগ পোহাতে হয়।' সম্প্রতি ঢাকার মতিঝিল থানার একজন ভুক্তভোগী জানান, জিডি এন্ট্রি করার জন্যও তার কাছে মোটা অংকের টাকা দাবি করেছে পুলিশ। অভিযোগকারীর পোশাক এবং পেশার ওপর নির্ভর করে টাকার পরিমাণ। তিনি জানান, তার সামনেই লুঙ্গি পরিহিত এক ব্যক্তির কাছ থেকে এ কাজে ৩শ' টাকা দাবি করা হলে তিনি দেড়শ' টাকা দিয়ে জিডির কপি নিয়ে যান। এরপর একজন পদস্থ ব্যাংকার জিডি করতে আসেন। তার পেশা জানতে পেরে কর্তব্যরত অফিসার বলে ওঠেন, 'আপনি তো টাকার জায়গায় আছেন। আপনি ৫শ' টাকা দিবেন।' শেষ পর্যন্ত অবশ্য ৩শ' টাকায় দফারফা হয়।

পুলিশের নানা অপকর্ম

দেশের মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থতার পাশাপাশি পুলিশের বিরুদ্ধে একাধারে ছিনতাই, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, অপহরণ, ডাকাতি, দুর্নীতি, ধর্ষণ, জমি ও বাড়ি দখল এবং টাকা লুটসহ গুরুতর অভিযোগের মাত্রা অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। একের পর এক প্রকাশ হচ্ছে- এসি আকরাম, এসপি মোফাজ্জল, ওসি রফিক, এসআই খলিল, সার্জেন্ট আসাদুজ্জামান ও জুলফিকার আলীদের মতো দুর্নীতিবাজ ও অপরাধী পুলিশ সদস্যের নানা অপকর্মের খবর। এ ধরনের অল্প কিছু ঘটনার বিচার হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে বা অপরাধীরা কোনো না কোনোভাবে পার পেয়ে গেছে। গত ৬ মাসে খোদ রাজধানীতেই পুলিশের প্রায় ৪শ' সদস্যের বিরুদ্ধে মারাত্মক অপরাধের অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে ৩শ' সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। এ সময়ে র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যদের দ্বারা অন্তত ২০টি বড় অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। জানা গেছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুলিশ সদর দপ্তর এবং পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে হাজার হাজার অভিযোগ জমা পড়েছে।

জানা গেছে, গত আড়াই বছরে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রায় ৪০ হাজার সদস্যকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করেছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ। এদের বিরুদ্ধে ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও নারী কেলেংকারীসহ নানা ধরনের অপরাধের অভিযোগ রয়েছে এবং প্রমাণও মিলেছে। তবে অপরাধীদের বিরুদ্ধে একই বিভাগের সদস্যরা তদন্ত করায় অধিকাংশই নানাভাবে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। যেমন- গত এক বছরে বারো হাজার সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের মধ্যে মাত্র ২ হাজার ১শ' ৭৪ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে নামমাত্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

পুলিশ বাহিনীর এক শ্রেণীর সদস্য 'ক্রসফায়ার', 'এনকাউন্টার' ও 'লাইন অব ফায়ার'-এ হত্যার ভয় দেখিয়ে চাঁদাবাজি করার অভিযোগ উঠেছে। শুধু দেশের সড়ক পথ থেকেই পুলিশ বছরে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা চাঁদাবাজি করছে বলে এক তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। আর পাওনা টাকা আদায় করে দেওয়ার মাধ্যমে কমিশন নেয়ার অভিযোগও রয়েছে পুলিশের বিরুদ্ধে। অভিযোগ আছে, রাতের বেলায় মাত্র ১০-২০ টাকায় দেহ বিক্রি করে জীবীকা চালানো ভাসমান পতিতা, ফুটপাতের খুচরা দোকানদার ও হকার থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও পুলিশকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে চাঁদা নিয়ে থাকে।

পুলিশের প্রকাশ্য চাঁদাবাজি

মেট্রোপলিটন শহরগুলোতে বিশেষ করে রাজধানী ঢাকায় পুলিশের চাঁদাবাজি প্রায় সর্বজনবিদিত ঘটনা। ট্রাফিক এবং টহল পুলিশ নির্লজ্জের মতো প্রকাশ্যেই বিভিন্ন যানবাহন এবং ফুটপাতের দোকান থেকে চাঁদা আদায় করেন। ডিএমপিতে কর্মরত ট্রাফিক সার্জেন্টদের (মোট সংখ্যা ৫৪৪ জন) বেশির ভাগেরই দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের বেশির ভাগ জুড়ে থাকে চাঁদাবাজি।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, রাজধানীর ২৭টি স্পটে ট্রাফিক সার্জেন্টরা গাড়ি থামিয়ে চাঁদা আদায় করেন। এগুলো হলো- যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা, পোস্তগোলা, সায়েদাবাদ, ইত্তেফাক মোড়, মতিঝিল, গুলিস্তান, নয়াবাজার মোড়, পল্টন, প্রেসক্লাব মোড়, মৎস্য ভবন, কাকরাইল, শান্তিনগর, মালিবাগ, মগবাজার, শাহবাগ, বাংলামোটর, ফার্মগেট, রোকেয়া সরণি, শ্যামলী, টেকনিক্যাল মোড, রামপুরা, গাবতলী,

---

ঊর্ধতন কর্মকর্তা চৌধুরী কামরুল হাসান, এডিশনাল আইজি ফাইন্যান্স এন্ড ডেভেলেপমেন্ট। এই কর্মকর্তাও কোনো কাগজ কিংবা কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা জানাতে পারেননি।

এদিকে পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা হলে তারা জানান, পুলিশের কল্যাণ ট্রাস্টে সাড়ে ৫ কোটি টাকা আছে। পুলিশের অভিযোগ, এই টাকা কল্যাণের কোনো কাজে লাগছে না। বরং উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই টাকা দিয়ে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে একটি কমপ্লেক্স তৈরি করা হবে বলে জানান। এ বিষয়টি নিয়ে চৌধুরী কামরুল হাসানের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, কল্যাণ ট্রাস্টের টাকা পুলিশের সার্বিক কল্যাণেই ব্যবহার হবে। মিরপুরে ২টি পুলিশের আবাসনের ব্যারাকের কাজ শুরু হয়েছে। আরো ৩টি হবে। রাজারবাগেও হবে ২টি ব্যারাক। এতে পুলিশের কনস্টেবল ও এএসআইদের আবাসন ব্যবস্থা হবে। এটা কি তাদের কল্যাণকর নয়?

উগ্রতা, দায়িত্বহীনতা, অবাধ্যতা, কুবুদ্ধি, ভীরুতা ও অদক্ষতা-মানব চরিত্রের এক নেতিবাচক দিকগুলোই হচ্ছে বর্তমান পুলিশের বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে বিএনপি-জামায়াত জোটের সরকারের চার বছরের পুলিশের এ বৈশিষ্ট্য যেন বহুমাত্রা পায়।

রাজনৈতিক নিয়োগ, রাজনৈতিক রক্ষাকবচ, লক্ষ্য গডফাদারকে সন্তুষ্ট করা।

চাকরি পেতে ঘুষ, পোস্টিং পেতে ঘুষ, প্রমোশনে ঘুষ, ঘুষের টাকা জোগাড় যে কোনোভাবে।

বেতন কম কাজ চালাতে ও টাকা দিতে হয় নিজ পকেট থেকে।

অপরাধী চক্রের সঙ্গে হাত মেলালেই অনেক টাকা। বখরা দিলে সাজাও হয় না।

যার ফলে-১. রাজশাহীর এসপি মাসুদ মিয়ার হাত ধরে উঠে আসে বাংলাভাই ও তার হিংস্রবাহিনী। এসপি মাসুদ মিয়া এখন পুলিশ হেড কোয়াটারে বদলি হয়ে এসেছে।

২. জমির জন্য কাফরুল থানার ওসি রফিক হত্যা করে কলেজ ছাত্র মোমিনকে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৫ সালে। সে এখন জেলে।

৩. ৬ আগস্ট ২০০৫। রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ৬ পুলিশ সদস্য ভিআইপিদের নিরাপত্তার কাজে থাকা অবস্থায় মুন্সীগঞ্জের এক চাল ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা ছিনতাই করতে গিয়ে ধরা পড়ে। ৪ পুলিশ এখনো ধরা পড়েনি।

৪. সবুজবাগ থানার ৪ পুলিশ ৬ এপ্রিল ২০০৫ মাদারটেকের এক বাসায় ঢুকে ১০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। পুলিশ উল্টো ওই বাসার গৃহবধূ পারুল বেগমের নামে মাদকদ্রব্য ব্যবসার অভিযোগ এনেছে।

৫. রায়ের বাজার পুলিশ বাসায় ঢুকে স্ত্রী ও শিশু কন্যার সামনে মোহাম্মদ আলী নামে এক দলিল লেখককে নির্মমভাবে দুই দফায় গুলি করে হত্যা করে। তার বাসায় সন্ত্রাসী ঢুকে আশ্রয় নিয়েছে এই অজুহাতে গত বছর জুলাইতে এ ঘটনা ঘটায় পুলিশ।

প্রকাশ্যে দিনের বেলায় মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ এ হত্যাকান্ড ঘটায়। পুলিশ ও পুলিশের সহায়তাদানকারী প্রভাবশালীদের দাপটে মোহাম্মদ আলীর পরিবার এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়।

পুলিশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরাই পুলিশের কনস্টেবল, এসআই ও সার্জেন্ট পদে নিয়োগ পায়। ধার-কর্জ করে বড় অঙ্কের টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরি নেয়। তাই শুরুতেই ঘুষ পুষিয়ে নিতে ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজিসহ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

সাজেদুর রহমান

মিরপুর-১, মিরপুর-১০, আসাদগেট এবং সাইন্স ল্যাবরেটরি থেকে নীলক্ষেত এলাকা। এসব স্পটের এক একটিতে ৩ থেকে ৫ জন সার্জেন্ট দায়িত্ব পালন করেন। এর বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় যত্রতত্র গাড়ি রাস্তার ওপর গাড়ি থামিয়ে 'চাঁদা' নেয় পুলিশ। বিশেষ করে সার্জেন্টরা গাড়ি থামিয়ে পরীক্ষা করতে চান। তখন ড্রাইভাররা লাইসেন্স ও কাগজপত্রের ভেতরে ৫০ থেকে ১০০ টাকা গুঁজে দেন। ব্যস, মুহূর্তের মধ্যেই ওই গাড়ি ছেড়ে দেয় সার্জেন্ট। ঢাকায় দায়িত্বরত অধিকাংশ গাড়ি চালকদের অধিকাংশেরই লাইসেন্স নকল বা 'দুই নম্বর' হওয়ায় এ সুযোগ নিয়ে ট্রাফিক পুলিশরা উৎকোচ আদায় করে।

অন্যদিকে শহরের ফুটপাত ও রাস্তার পার্শ্বের ছোট ছোট দোকান থেকে মাসিক ভিত্তিতে নিয়মিত চাঁদা আদায় করে ট্রাফিক এবং টহল পুলিশ। রাতে চলাচলকারী মালবাহী ট্রাক চালকদের কাছ থেকেও বিভিন্ন স্পটে চাঁদা নেয় পুলিশ। চাঁদা না দিলে নানা হয়রানির শিকার হতে হয়।

পুলিশও নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত

একথাও ঠিক যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা এখনো পুলিশ বাহিনীর জন্য যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিত করেনি। নিম্নমানের অবকাঠামোগত সুবিধা, অপ্রতুল জনবল, সেকেলে অস্ত্র-শস্ত্র, আধুনিক সুযোগ-সুবিধার অভাব, অপর্যাপ্ত ও নিম্নমানের যানবাহন, অপ্রতুল প্রশিক্ষণ, বেতন, আবাসন, রেশন ইত্যাদি। এর ওপর রয়েছে রাজনৈতিক ব্যবহার ও চাকুরির অনিশ্চয়তা। আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র, যানবাহন ও প্রযুক্তিগত সহায়তার অভাবেও অনেক সময় পুলিশ অত্যাধুনিক অস্ত্রধারীদের সঙ্গে পেরে উঠে না বা ধরতে পারে না।

পুলিশের মানবেতর জীবন

সমাজের প্রতি পুলিশ যেমনি সচরাচর অমানবিক আচরণ করে থাকে তেমনি এ বাহিনীকেও নিছক মানবেতর জীবনযাপন মেনে নিয়েই চাকরি করতে হচ্ছে। দেশে জীবন যাত্রার ব্যয় ব্যাপক বৃদ্ধি পেলেও সে হারে বাড়েনি পুলিশ বাহিনীর সুযোগ-সুবিধা। চাকুরির বয়স অনুযায়ী সাড়ে ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা বেতনে চাকুরি করছেন এ বাহিনীর নিম্নস্তরের সদস্যরা। এদের পারিবারিক রেশন এ্যালাউন্স মাসিক ১২শ' টাকা। অতিরিক্ত খাটুনির জন্য মাসিক ভাতা ৪শ' টাকা। অথচ অধিকাংশ পুলিশ সদস্যকে প্রায় ২৪ ঘণ্টাই দায়িত্ব পালন করতে হয়। দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন করলেও বছরে মাত্র দু' সেট পোশাক পান পুলিশ সদস্যরা। ফলে প্রতিদিন ধোলাই না করলে নোংরা পোশাক পরেই দায়িত্ব পালন করতে হয়। কিন্তু কাপড় ধোলাই আর চুল ছাটা মিলিয়ে মাসিক ভাতা মাত্র ৩৫ টাকা।

পুলিশ বাহিনীর আবাসন ব্যবস্থার দশা একেবারেই বেহাল। অধিকাংশ থানা ও ব্যারাকের অবস্থা খুবই করুণ। জরাজীর্ণ ভবনের স্যাঁতস্যাঁতে মেঝেতেই বিছানা পেতে গাদাগাদি করে রাতযাপন করতে হয় কনস্টেবলদের। নিয়মিত ছুটিও পায় না তারা। এসব অপ্রাপ্তি ও বঞ্চনা পুলিশের দক্ষতা প্রদর্শন ও দায়িত্ব পালনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় বলে তারা দাবি করেন।

সুযোগ পেলেই পুলিশ এভাবে বেধড়ক লাঠিপেটা করে

রাজধানীর পুরানা পল্টনে দায়িত্ব পালনকালে সম্প্রতি আবদুল হামিদ নামে এক পুলিশ কনস্টেবল এ প্রতিবেদককে বলেন, সরকার এবং জনগণ কেউই আমাদের মানুষ মন করে না। সারাদিন গাধা খাটুনির পর যে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় তাতে আমাদের বেঁচে থাকাই দায়। তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, আমরা তো সবারই শত্র! সমাজে আমাদের কষ্টের কথা শোনার মানুষ কোথায়?

ঢাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, পুলিশের যা বেতন আর সুযোগ-সুবিধা তাতে সমাজে সম্মান নিয়ে বাঁচতে হলে ঘুষ খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তিনি বলেন, বর্তমান অবকাঠামো নিয়ে এদেশের পুলিশ বাহিনী যতটুকু দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রদর্শন করছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও তা সম্ভব নয়।

প্রয়োজন আমূল সংস্কার

যে কোনো দেশের জন্য পুলিশ বাহিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিভাগ। সুশীল সমাজ, সাধারণ মানুষ ও পুলিশ বিভাগের লোকজনের সঙ্গে আলাপকালে এ বাহিনীর আধুনিকায়ন ও উন্নয়নে কিছু পরামর্শ উঠে আসে। তারা সবাই প্রায় এক বাক্যে বলেন, পুলিশকে নিরপেক্ষ, আধুনিক, যুগোপযুগি এবং সক্ষম একটি বাহিনী গড়ে তোলা জরুরি। এজন্য পুলিশ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। বৃটিশ প্রণীত আইন পরিবর্তন ও সংশোধন করা দরকার। সেই সঙ্গে দেশের আয়তন এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা বিবেচনা করে হবে পুলিশ বাহিনীর জনবলও বাড়াতে হবে।

পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য সারদা পুলিশ একাডেমীতে পাঠানো হয়। বৃটিশ আমলের ক্যারিক্যুলাম অনুযায়ী শারীরিক কসরত শেখানোই এ একাডেমির মূল কাজ। কিন্তু সেখানেও কাঠামোগত ও ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে তোলার দুর্বলতা এবং প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদির অপ্রতুলতা রয়েছে। এদিকে নজর দিতে হবে সরকারকে।

পুলিশ বাহিনীকে অধিকতর গতিশীল ও কার্যকর করার জন্য অবশ্য সাম্প্রতিক সময়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জনবল বৃদ্ধির জন পুলিশ সুপার থেকে কনস্টেবল পর্যন্ত মোট ৫৭৬৮টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য কেনা হচ্ছে ২৭৫ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক উপকরণ। যার একটা অংশ ইতোমধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে।

পুলিশের কোনো সদস্য কর্তব্যরত অবস্থায় মারা গেলে তার পরিবারের জন্য আর্থিক অনুদান ১ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ লাখ টাকা দেওয়ার নিয়ম করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে পুলিশ স্টাফ কলেজ। বাড়ানো হচ্ছে প্রশিক্ষণকালীন সুযোগ-সুবিধাও। পুলিশ বাহিনীর অফিস ও বাসভবন নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য ৩১৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। কিন্তু গোড়ায় গলদ রেখে এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে কতটুকু এগুতে পারবে পুলিশ বাহিনী– এ প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। কারণ ঔপনিবেশিক আমলের আইন-কানুন বহাল রেখে পুলিশ বাহিনীকে কার্যকর করা অসম্ভব বলে মনে করেন অনেকেই।

দুর্নীতিসহ নানা অপরাধ প্রবণতা রোধ করতে হলে এ বিভাগের কর্মকর্তাদের সম্পত্তি ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ বাধ্যতামলক করা, পুলিশের অভ্যন্তরে কাউন্টার ইন্টিলিজেন্স ম্যানুয়াল ও আচরণবিধি প্রণয়ন করা এখন সময়ের দাবি। কিন্তু তিন বছর আগে একটি উদ্যোগ নেয়া হলেও স্বার্থান্বেষীদের বাধায় পুলিশের দুর্নীতি ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড কমিয়ে আনার লক্ষ্যে আজ পর্যন্ত গঠিত হয় নি 'কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স'।

তবে পুলিশ বাহিনীর মানসিকতাও পরিবর্তন আনতে হবে। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যাতে তাদরে মধ্যে সমাজের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, মানবাধিকার, দেশপ্রেম ও কর্তব্যবোধে জাগ্রত হয়। কিন্তু পুলিশ বাহিনী কি তা মেনে চলবে? আর এসব কিছুর আগে পুলিশকে দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে এ বাহিনীতে। তবে পুলিশ বাহিনীকে দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল করে তুলতে হলে যে ক্ষমতাসীন ও সব বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদিচ্ছার প্রয়োজন তা নিঃসন্দেহ।